সমকাল

তারিখঃ ২৪/০৮/২০২২ (পৃঃ ১৫)

২০৩০ সালে চাল উৎপাদন কমবে ৩৬ লাখ টন

বিএআরসির গবেষণা

জলবায়ু পরিবর্তন, লবণাক্ততা ও পানির অভাবে চ্যালেঞ্জে পড়বে কৃষি

■ সমকাল প্রতিবেদক

জলবায়ু পরিবর্তন, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, সেচের পানির অভাবসহ বিভিন্ন প্রতিকূলতা বাড়তে থাকলে ২০৩০ সালের মধ্যে চাহিদার তুলনায় ৩৬ লাখ টন চালের উৎপাদন কম হবে। ২০৩০ থেকে ২০৫০ সাল পর্যন্ত ধান-গমসহ ২৮টি ফসলের ভবিষ্যৎ চাহিদা ও জোগান নিরূপণে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) পরিচালিত গবেষণা প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর ফার্মগেটে বিএআরসি মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০৩০ ও ২০৫০ সালে চালের চাহিদা হবে যথাক্রমে ৩.৯১ কোটি ও ৪২.৬ কোটি টন। উৎপাদন দাঁড়াবে ৪.১০ কোটি ও ৫.২১ কোটি টনে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব চলতে থাকলে এ উৎপাদন যথাক্রমে ৩.৫৪ কোটি ও ৪.০৬ কোটি টনে নেমে আসবে। অর্থাৎ ২০৩০ সালে প্রায় ৩৬ লাখ টন ও ২০৫০ সালে ১৯ লাখ টন চালের সরবরাহ ঘাটতি তৈরি হবে। ২০২১ সালে চালের চাহিদা ছিল ৩.৫২ কোটি টন, যার বিপরীতে স্থানীয়ভাবে সরবরাহ পাওয়ার কথা ছিল ৩.৫৬ কোটি টন। কিন্তু সেখানে বন্যাসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সরবরাহ ছিল ৩.৪৫ কোটি টন।

খাদ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য বলছে, চাহিদার তুলনায় উৎপাদন ঘাটতির কারণে ২০২১ সালে সাড়ে ১৩ লাখ টন চাল আমদানি করতে হয়েছে।

গবেষণায় বলা হয়েছে, বাংলাদেশের মানুষের খাদ্য গ্রহণের তালিকা ধীরে ধীরে বৈচিত্র্যময় হচ্ছে। দানাদার খাদ্য থেকে সিংহভাগ ক্যালরি গ্রহণ করলেও মোট ক্যালরি গ্রহণের হার অনেক কমে গেছে। ১৯৯০ সালে দানাদার খাদ্য থেকে মোট ক্যালরি গ্রহণের হার ছিল ৮৯.৬ শতাংশ, যা ২০১০ সালে কমে ৮৩.০ শতাংশ ও ২০২১ সালে ৮০.৫ শতাংশ হয়েছে। ১৯৯০ সালে শুধু চাল থেকে ক্যালরি গ্রহণের হার ছিল ৮০.৪ শতাংশ, যা ২০২১ সালে কমে ৭০.৫ শতাংশ হয়েছে এবং আগামী ২০৩০ ও ২০৫০ সালে হবে যথাক্রমে ৭২.৬ ও ৭০.৪ শতাংশ। গম থেকে ক্যালরি গ্রহণের হার ২০১০ সালে ছিল ৬.৬ শতাংশ; ২০৩০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হবে ৬.৭ শতাংশ, যা অব্যাহত থেকে ২০৫০ সালে ৬.৮ শতাংশে পৌঁছাবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে কৃষিমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, এ ধরনের গবেষণা খুবই প্রয়োজন। সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে চাল-গমসহ বিভিন্ন ফসলের চাহিদা ও উৎপাদনের পরিসংখ্যান থাকলে সুষ্ঠু পরিকল্পনা করা সম্ভব হয়। পরিস্থিতি মোকাবিলায় আগাম ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব। তবে গবেষণা আরও সঠিক করার নির্দেশনা দিয়ে মন্ত্রী বলেন, ভুট্টা ও গমের চাহিদা ঠিক হয়নি। এখনই ভুট্টার চাহিদা ৬৫ লাখ টন, যেখানে ৫৫ লাখ টন উৎপাদন ও ১০ লাখ টন আমদানি হচ্ছে। কিন্তু গবেষণায় যে তথ্য বলা হয়েছে, তার সঙ্গে বাস্তবতার ব্যাপক ফারাক।

গবেষণার ফলাফলে বলা হয়েছে, সরিষার তেলের চাহিদা ধীরে ধীরে বাড়লেও তা নিজস্ব উৎপাদন দিয়ে পূরণ করা যাবে না। মসলার মধ্যে এ সময়ে শুধু পেঁয়াজে উৎপাদন বেশি হলেও আদা, রসুন, মরিচ, হলুদে চাহিদার তুলনায় উৎপাদনে ঘাটতি থেকেই যাবে। একই অবস্থা থাকবে ডালজাতীয় ফসলেও। তবে সবজির উৎপাদন চাহিদার তুলনায় বেশি থাকবে এবং ফলের উৎপাদন বাড়লেও চাহিদার সবটা পূরণ করা সম্ভব হবে না।

বিভিন্ন ফসলের উৎপাদন ঘাটতি পূরণ করতে উন্নত জাতের বীজের ব্যবহার বৃদ্ধি, জলবায়ু সহনশীল প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও ব্যবহার, ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সব সময় ১-২ মিলিয়ন টন চালের মজুত রাখা, উৎপাদিত ফসলের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা, কৃষিপ্রযুক্তি উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও বাজার ব্যবস্থার আধুনিকায়নে গুরুত্ব দেওয়ার পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে গবেষণায়।

দেশ রূপান্তর

তারিখঃ ২৪/০৮/২০২২ (পৃঃ ০৮)

ধান-গমসহ ২৮ ফসল নিয়ে বিএআরসির গবেষণা

২০৫০ সালে কোটি টন চাল উদ্বৃত্ত থাকবে

নিজস্ব প্রতিবেদক

২০৫০ সালে দেশে চালের যে উৎপাদন হবে, তা স্থানীয় চাহিদা মিটিয়েও ১ কোটি ২০ লাখ টন উদ্বৃত্ত থাকবে। ধান, গমসহ ২৮টি ফসলের ভবিষ্যৎ চাহিদা ও জোগান নিয়ে এক গবেষণায় এ তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি)।

বিএআরসি জানিয়েছে, ২০৩০ সালে মানুষের খাদ্য হিসেবে এবং অন্যান্য প্রয়োজনে (বীজ, প্রাণী ও মৎস্য খাদ্য, শিল্প, অপচয় ইত্যাদি) চালের মোট চাহিদা হবে ৩ কোটি ৯১ লাখ টন এবং ২০৫০ সালে ৪ কোটি ২৬ লাখ টন। বর্তমান উৎপাদন অবস্থা বিদ্যমান থাকলে আগামী ২০৩০ ও ২০৫০ সাল নাগাদ স্থানীয় উৎপাদনের মাধ্যমে চালের মোট জোগান হবে যথাক্রমে ৪ কোটি ৩২ লাখ এবং ৫ কোটি ৪৯ লাখ টন।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) মিলনায়তনে ধান, গমসহ ২৮টি ফসলের ভবিষ্যৎ চাহিদা ও জোগান নিরূপণে পরিচালিত গবেষণার চূড়ান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আবদুর রাজ্জাক। এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন কৃষি সচিব মো. সায়েদুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান শেখ মো. বখতিয়ার।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের (বিএআরসি) অধীনে দেশের বিশিষ্ট কৃষি অর্থনীতিবিদ ও গবেষকের নেতৃত্বে নার্সভুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীদের (কৃষি অর্থনীতিবিদ) সমন্বয়ে গঠিত গবেষণা দলের মাধ্যমে এ স্টাডি পরিচালিত হয়। ২০৩০ এবং ২০৫০ সালে ফসলের (খাদ্যশস্য) অভ্যন্তরীণ চাহিদা ও জোগানের ঘাটতি/উদ্বৃত্ত প্রাক্কলন করতেই মূলত স্টাডিটি করা হয়।

গবেষণায় বলা হয়, বাংলাদেশের জনগণের খাদ্যগ্রহণের তালিকা ধীরে ধীরে বৈচিত্র্যময় হচ্ছে। দানাদার খাদ্য থেকে সিংহভাগ ক্যালোরি গ্রহণ করলেও মোট ক্যালোরি গ্রহণের হার অনেক কমে গেছে। ১৯৯০ সালে দানাদার খাদ্য থেকে মোট ক্যালোরি গ্রহণের হার ছিল ৮৯ দশমিক ৬ শতাংশ, যা ২০১০ সালে হ্রাস পেয়ে ৮৩ শতাংশ এবং ২০২১ সালে ৮০ দশমিক ৫ শতাংশ হয়েছে। ১৯৯০ সালে শুধু চাল থেকে ক্যালরি গ্রহণের হার ছিল ৮০ দশমিক ৪ শতাংশ, যা ২০২১ সালে হ্রাস পেয়ে ৭০ দশমিক ৫ শতাংশ হয়েছে এবং আগামী ২০৩০ এবং ২০৫০ সালে হবে যথাক্রমে ৭২ দশমিক ৬ শতাংশ এবং ৭০ দশমিক ৪ শতাংশ। গম থেকে ক্যালরি গ্রহণের হার ২০১০ সালে ছিল ৬ দশমিক ৬ শতাংশ, ২০৩০ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হবে ৬ দশমিক ৭ শতাংশ; যা অব্যাহত থেকে ২০৫০ সালে ৬ দশমিক ৮ শতাংশে পৌঁছাবে।

> প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে ২০৩০ সালে ৩৬ লাখ টন এবং ২০৫০ সালে ১৯ লাখ টন চালের ঘাটতি দেখা দিতে পারে

২৮টি ফসলের ভবিষ্যৎ চাহিদা ও জোগান নিয়ে স্টাডির প্রসঙ্গে কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আবদুর রাজ্জাক বলেন, এ ধরনের স্টাডি খুবই প্রয়োজন। সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে চাল, গমসহ বিভিন্ন ফসলের চাহিদা ও উৎপাদনের পরিসংখ্যান থাকলে সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রয়োজন করা সম্ভব হয়। পরিস্থিতি মোকাবিলায় আগাম ব্যবস্থা গ্রহণ করাও সম্ভব হবে।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, আমন চাল উৎপাদনের দ্বিতীয় বৃহত্তম মৌসুম। খরা আর অনাবৃষ্টির কারণে এ বছর আমন রোপণ ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে জ্বালানি তেলের দাম বেশি। গ্রামগঞ্জে অনেক সময় বিদ্যুৎ থাকছে না। সেচ সংকট তৈরি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে দেরিতে লাগানো আমনের ক্ষেত এখন সেচের অভাবে ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। সেজন্য আমন নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছি। মন্ত্রী বলেন, কিছু ব্যবসায়ী অনেক চতুর। তারা আমনের উৎপাদন কমবে জেনে ইতিমধ্যে চাল মজুদ করছে। সেজন্য বাজারে চালের সরবরাহ কমায় দাম বাড়ছে। বৈশ্বিক সংকটের কারণে দেশেও কিছু পণ্যের দাম বেড়েছে। সেটিকে কাজে লাগিয়ে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অতিরিক্ত মুনাফার জন্য দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে।

বিএআরসির গবেষণায় বলা হয়েছে, আগামী কয়েক দশক দেশের কৃষি উৎপাদন জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, মাটির লবণাক্ততা বৃদ্ধি, সেচের পানির অভাব ইত্যাদি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হবে। প্রতিকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে ধান উৎপাদন ব্যাপক ব্যাহত হবে। এটি মোকাবিলায় অধিক উৎপাদনশীল নতুন ধান প্রযুক্তি কৃষক পর্যায়ে জনপ্রিয় করা অত্যাবশ্যক— যাতে মোট উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখা যায়। আশা করা যায়, দীর্ঘমেয়াদে নতুন ধান প্রযুক্তি পাওয়া যাবে এবং কৃষক পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য হবে।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, স্বাভাবিক অবস্থা বিবেচনায় ২০৩০ ও ২০৫০ সালে উদ্বৃত্ত চালের পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ৪১ লাখ টন ও ১ কোটি ২৩ লাখ টন। কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতি (বিরূপ আবহাওয়া, উৎপাদন উপকরণ সংকট ইত্যাদি) সৃষ্টি হলে ২০৩০ সালে ৩৬ লাখ টন এবং ২০৫০ সালে ১৯ লাখ টন চালের ঘাটতি দেখা দিতে পারে।